বাইরে বারিধারা আর সাথে ভিতরে ‘লক-ডাউন’-এর বন্দী জীবন। সুতরাং এই বাঁধাধরা জীবনের মাঝে স্বস্তির ঠিকানা হল – গল্পপাঠ। আর বর্ষার নিস্তব্ধ সন্ধ্যায় কিংবা রাতের সঙ্গী যদি রহস্য গল্প হয়, তাহলে মন্দ হয় না। তাই সাহিত্য-প্রেমী বন্ধুদের রাজনৈতিক ডামাডোল ও রোজনামচার একঘেঁয়েমি থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য, আর তাঁদের রহস্যের রসে রোমাঞ্চিত করার ভাবনা নিয়েই গুঞ্জনের ‘রহস্য-রোমাঞ্চ’ সংখ্যাকে সাজিয়ে তোলা হল...

গুঞ্জন

গুঞ্জন
গুঞ্জন
গুঞ্জন
গুঞ্জন

মাসিক ই-পত্রিকা

বর্ষ ৩, সংখ্যা ২
জুলাই ২০২১

রহস্য-রোমাঞ্চ সংখ্যা

কলম হাতে

ডাঃ অমিত চৌধুরী, দীপঙ্কর সরকার, ডঃ মালা মুখার্জী, রিয়া মিত্র, প্রণব কুমার বসু, সুনৃতা রায় চৌধুরী এবং পাণ্ডুলিপির অন্যান্য সদস্যরা...

প্রকাশনা

পাণ্ডুলিপি (গল্প, কবিতা, গান, গদ্য ও নাটকের আসর)

বি.দ্র.: লিটল ম্যাগাজিন হিসাবে মুদ্রিত এই পত্রিকাটির প্রথম প্রকাশ হয় ইং ১৯৭৭ সালে...

যোগাযোগের ই-মেলঃ contactpandulipi@gmail.com

পায়ে পায়ে

বিগত দুইটি বছরে বহু লেখক ও লেখিকাদের পাশে পেয়েছে আমাদের গুঞ্জন ই-পত্রিকাটি, তাঁদেরই সহযোগিতায় আজ এই ক্ষুদ্র প্রয়াসটি বিভিন্ন দেশে সমাদৃত হচ্ছে। তবে কি শুধু লেখা প্রকাশের মধ্যে দিয়েই লেখক বা লেখিকার দায়িত্ব শেষ? না, তা কিন্তু নয়। একটা পত্রিকাতে শুধু একক ভাবনার প্রকাশ থাকে না। পত্রিকা মানে — লেখা, আঁকা, চিত্রগ্রহন, সম-আলোচনা আরও খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে তৈরি অনেক শিল্পীর আত্মপ্রকাশের শৈল্পিক মঞ্চ। তাই নিজের লেখার পাশাপাশি পত্রিকার অন্যান্য শিল্পীদের সৃষ্টিকেও পড়ে দেখুন ও নিজের মতো করে বুঝে মতামত প্রকাশ করুন। কারণ 'সকলে আমরা সকলের তরে।' একজন লেখকই পারে সুপাঠক হিবাবে স্বাধীনভাবে নিজের মত প্রকাশ করে, অন্যদের অনুপ্রাণিত করতে। আপনাদের 'গুঞ্জন' হল সেই নিঃশুল্ক মাধ্যম, যেখানে আপনি লেখার সাথে সাথে সাহিত্য রস আস্বাদন করতে পারেন। তাই প্রিয় পাঠক-পাঠিকাদের পাশাপাশি সুসাহিত্যিকদের পঠন-পাঠন অনুপ্রেরণার মঞ্চকে সুবিস্তৃত করবে। ■

বি. দ্র. – বর্তমান পরিস্থিতিতে অর্থাৎ লকডাউন, অর্থনৈতিক অবনতি, ক্ষীণ নেটওয়ার্ক প্রভৃতি কারণে আমাদের 'গুঞ্জন' ই-পত্রিকাটি বিগত কয়েক মাস ধরে যথা সময় প্রকাশ করা সম্ভব হচ্ছে না। তবে আপনাদের ঐকান্তিক অনুপ্রেরণায় আপনাদের প্রিয় 'গুঞ্জন' এগিয়ে চলবেই।

বিনীতা —রাজশ্রী দত্ত, সম্পাদিকা, গুঞ্জন

পাণ্ডুলিপির প্রকাশিত গ্রন্থ

রহস্য গল্পের প্রাপ্তবয়স্ক পাঠকদের জন্য আর একটি অবশ্য পঠনীয় গ্রন্থ “রহস্যের ৬ অধ্যায়” প্রকাশিত হয়েছে। আধুনিক যুগের পটভূমিতে, মানুষ কেমনভাবে নিজেনিজেই রহস্যের জালে জড়িয়ে পড়ছে – আর সেই আবর্তে কিভাবে পিষ্ট হচ্ছে, তাই নিয়েই এই ছয়টি গল্পের রচনা। কলকাতার কলেজ স্ট্রীটে ‘অরণ্যমন’এর স্টল থেকে বইটি সংগ্রহ করতে ভুলবেন না।

কলকাতার অন্যান্য বুক স্টলেও বইটি পাওয়া যাচ্ছে...

কলম হাতে

হস্তাঙ্কন

ছবির নামঃ গণেশ দাদা...

শিল্পীঃ রিত্বিকা চ্যাটার্জি ✧ বয়সঃ ১২ বছর

সবাই জানাবেন এই উদীয়মান শিল্পীর ছবিটি কেমন লাগল...

নমামি দেবী নর্মদে

শিব দুহিতা নর্মদা

ডাঃ অমিত চৌধুরী

চতুর্থ পর্যায় (৫)

আজ ২৮ শে অক্টোবর ২০১৬। সকাল সাড়ে সাতটায় কুয়াশা একটু কাটতেই 'নর্মদে হর' বলে মহারাজের কাছে বিদায় নিলাম। গ্রামের ভিতর দিয়ে চলেছি। এক পাশে জঙ্গল অন্য পাশে গ্রাম। গ্রামটি ভীষণ নোংরা এবং অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ। যেখানে-সেখানে নোংরা পড়ে আছে। রাস্তার উপরেই পরিত্যক্ত জিনিস রয়েছে। আমরা খুব দ্রুত হেঁটে এই গ্রামটি পেড়িয়ে যাবার চেষ্টা করলাম।

জঙ্গলের পাশ দিয়ে রাস্তা। প্রাণীদের মধ্যে সব থেকে ধূর্ত যে প্রাণী, সেই শিয়াল আমাদের লক্ষ্য করতে দেখলাম। বেশ কিছুটা যাওয়ার পর দিব্যানন্দজী একটি ডাঙ্গো অর্থাৎ হায়না দেখালেন। তবে আমরা দলে ভারী তাই কোন সমস্যা হয়নি।

জঙ্গলের গভীরতা কমতে শুরু করল। কিন্তু রাস্তার দৈর্ঘ্য নয়। আস্তে আস্তে রোদের তাপ বাড়ছে। জল পিপাসায় গলা শুকিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু কোন দোকান বা গ্রাম নেই। বিরামহীন ভাবে হেঁটে চলেছি।

প্রায় সাড়ে এগারোটা নাগাদ একটি গ্রামের মধ্যে আমরা

ঢুকে পড়লাম। গ্রামটির নাম মাচা। জল পিপাসায় গলা শুকিয়ে গেছে। গ্রামের ভিতর দিয়ে এগিয়ে চলেছি হঠাৎ মুণ্ডিত মস্তক ৫০/৫২ বছরের এক প্রৌঢ় আমাদের সামনে হাত জোড় করে দাঁড়ালেন এবং আমাদের ওনার বাড়িতে চা খেতে অনুরোধ করলেন। সকাল থেকে চা তো দূরের কথা এক গ্লাস জল পর্যন্ত পেটে পড়েনি। তাই এই প্রস্তাব ফিরিয়ে দেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। ওনার বাড়ি গেলাম। শুনলাম উনি রাজপুত। ওনার নাম বিক্রম সিং গৌতম। আমাদের ওনার স্ত্রী চা না দিয়ে ঘোলের শরবত দিলেন। মা নর্মদা দুধের স্বাদ ঘোলে মেটালেন। গৌতমজী বললেন, "মহারাজ এই গ্রামের নাম মাচা কিন্তু আমার বিচারে এই গ্রামের নাম মা কী ছায়া।" গৌতমজীর নিজের গ্রাম সম্পর্কে এই বিশ্লেষণ আমার খুব ভালো লাগল। ওনার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে উঠে পড়লাম।

প্রায় দুই কিলোমিটার হেঁটে এলাম রাম ঘাটে রাম সীতার মন্দিরে। আমাদের আগের দিনের সেই চোদ্দো জন পরিক্রমাকারী এসেছেন। হয়তো অন্য কোন রাস্তা দিয়ে! মহারাজ আমাদের ভোজন প্রসাদ দিলেন। একটু বিশ্রাম নিয়ে যথারীতি দুপুর তিনটের সময় আবার বেড়িয়ে পড়লাম।

নর্মদার পাড় ধরে হেঁটে চলেছি। এবারে বর্ষায় নর্মদা দেখছি গ্রামের বেশ কিছু চাষের জমি গ্রাস করেছেন। ভেঙে পড়েছে একটি মন্দির। নদীর জলে তার ভগ্নাবশেষ দেখা

যাচ্ছে। নদীর এই ধ্বংসলীলার জন্য গ্রামবাসীরা খুবই আতঙ্কিত ও চিন্তিত।

চাষের জমির ভিতর দিয়ে প্রায় দু'ঘণ্টা হেঁটে নর্মদার পাড়ে এসে পড়লাম। এখানে নর্মদার সাথে কুব্জা নদীর সঙ্গম হয়েছে। একটি নৌকা আছে, কম বয়সী একটি মাঝিও আছে। তাহলে কি নৌকা করেই পাড় হতে হবে! জল কত গভীর জানি না। নিজেরা যখন কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারছি না, এমন সময় একটি ৭/৮ বছরের বাচ্চা মেয়ে কুব্জা নদীর পাড় থেকে আমাদের কাছে ডাকল।

কুব্জা নদীর ধারে একটি বাচ্চা মেয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। আমরা কাছে যেতে প্রথমে আমাদের মা নর্মদাকে প্রণাম করতে বলল। তারপর নর্মদা এবং কুব্জা নদীকে আরতি করে প্রসাদ দেওয়ার কথাও বলল। সবশেষে দক্ষিণা। আমরা দক্ষিণা এবং প্রসাদ দেওয়াতে মেয়েটি বলল, "এটি কুব্জা নদী খুব গভীর নয়, তোমরা হেঁটেই চলে যাও।" আমাদের পথ দেখিয়ে এগিয়ে নিয়ে চলল। খুব সাবধানে নদী পেড়িয়ে আমরা আর ঐ মেয়েটিকে আর দেখতে পাইনি। বিশাল নদীর চড়। তাই খুব তাড়াতাড়ি অন্য কোথাও লুকিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। তাহলে! এই তাহলের উত্তর যে পাওয়া যাবে না তা বুঝতে পেরেই আমরা আবার হাঁটা শুরু করলাম। খুব উঁচু চড়াই রাস্তা প্রায় তিন তলার সমান, এলাম অজেয়া গ্রামে। অনেকেই এখানে আজকের মতো থেকে যেতে অনুরোধ করছিল। কিন্তু সূর্যদেব তখনও

প্রকট আছেন তাই এগিয়ে যাওয়াই ঠিক করলাম।

রাস্তার ডান পাশে চাষের ক্ষেত আর বাম পাশে জঙ্গল। বেশ কিছুটা যাওয়ার পর জঙ্গল থেকে কয়েকটি ময়ূর ছুটে আসতে দেখলাম। আর একটি নান্দনিক দৃশ্য দেখতে পেলাম। হরিণ আর ময়ূরের খেলা। আমরা কতক্ষণ এই ভাবে খেলা দেখছিলাম জানি না। একটি কর্কশ শব্দে আমাদের চেতনা এল। এত সুন্দর একটি প্রাণী কিন্তু তার ডাক এত শ্রুতিকটূ, তা না শুনলে বিশ্বাস করা যায় না। আমি ময়ূরের ডাককে বলছি – অর্থাৎ কেকা। চাষের ক্ষেত থেকে একটি লোক 'নর্মদে হর' বলে দাঁড়াল। কাকাজী লোকটির কাছে জানতে চাইল, "এই প্রাণী দুটি তো প্রচুর ফসল নষ্ট করছে ,তোমরা বাঁধা দিচ্ছ না কেন?" লোকটি বলল, "ওরা তো মায়ের সন্তান। তাছাড়া মা তো আমাদের কম কিছু দেননি।" এরপর আর বলার কিছু নেই।

সন্ধ্যে হয়ে আসছে। যত তাড়াতাড়ি এগিয়ে যাওয়া যায় ততই ভালো। প্রত্যেক বারের মতোই আমার সেই চিরন্তন সমস্যা, দু'পায়ে বেশ কয়েকটি ফোসকা। চলায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে।

প্রায় সন্ধ্যের সময় এলাম বুলচা গ্রামে। অনেকটা জায়গা নিয়ে আশ্রম এবং আরো বিস্ময়ের ব্যাপার একটি সুবিশাল প্রাচীন বটগাছ। এই প্রাচীন বটগাছকে এরা বলে চবুতরা। যেটি আমাদের আজকের আশ্রয়স্থল। প্রচুর ঝুরি নেমেছে। মহারাজ, তলায় খড় পেতে পরিক্রমাকারীদের থাকার ব্যবস্থা

করেছেন। মাথার উপরে প্লাস্টিক বস্তার ছাউনি। বেশ কয়েকটি লাল পাড় শাড়ী দিয়ে গাছটিকে ঢেকে রাখা হয়েছে। যেহেতু নর্মদার পাড়ে তাই সন্ধ্যারতির জন্য এই জায়গাটি আমাদের উপযুক্ত বলে মনে হল। দীর্ঘদেহি সৌমকান্তি রুদ্রাক্ষের মালা পরিহিত মহারাজ আমাদের বিশ্রাম নিতে বললেন। চা এল, রাতের ভোজন প্রসাদ, এখানকার প্রচলিত ধারা অনুযায়ী, খিচুরী এল। দিব্যানন্দজী ফোসকাগুলো ফুটো করে জল বার করে দেওয়ার জন্য কিনা জানি না, আমার পা সেপ্টিক হয়ে গেছে, খুব জ্বর।

নর্মদে হর।

...ক্রমশ ■

নতুন বই
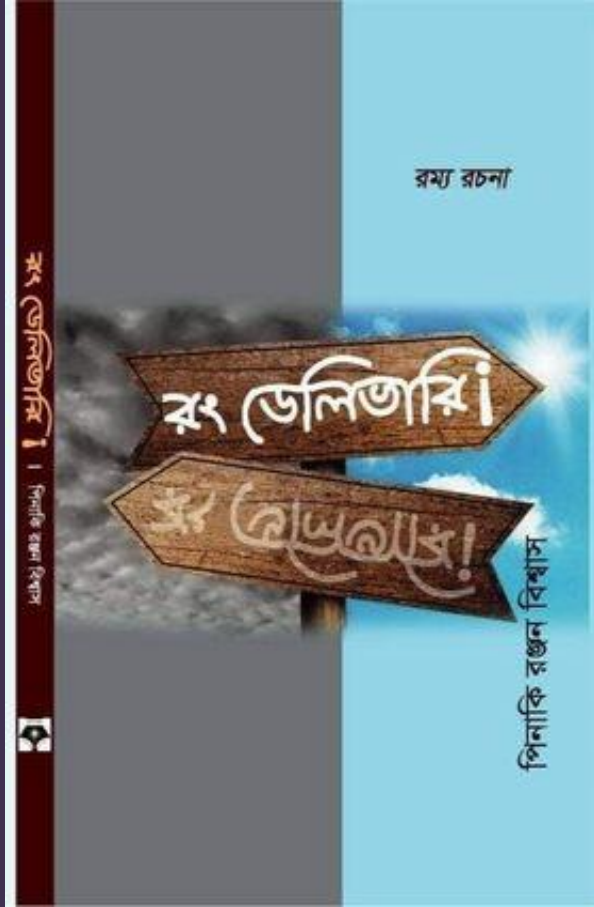
প্রতি পাতায় ভরা হাসি

যা কখনও হয়না বাসী...

সুসাহিত্যিক পিনাকি রঞ্জন বিশ্বাসের একটি অপূর্ব

রম্য রচনার সমাহার...

প্রাপ্তিস্থলঃ

https://www.rokomari.com/book/202818/rong-delivery

ভারতে শীঘ্রই আসছে...

শিকড় (গাঁ গেরামের গপ্পো)

(৮ম পর্ব)

দীপঙ্কর সরকার (বাংলাদেশ)

হিলির পরের স্টেশন বিরামপুর। সেখানেই নামতে হবে আমাদের। কাঁটাতারেরব কোল ঘেঁষে ট্রেন এগিয়ে চলছে। দু দিকে দুই জনপদ। কি বিচিত্র এই বিভাজন রেখা! র‍্যাডক্লিফ সাহেবও এমনভাবে ভাগ করেছেন যাতে আশ্চর্য হতে হয়। হয়তো তালগাছের গোড়াটা বাংলাদেশে কিন্তু গাছটা একটু বাঁকা হয়ে যে তাল ধরেছে তার সীমানা ভারতে। আকাশটাই স্বাধীন; স্বাধীন মেঘগুলো; স্বাধীন পাখিও – কিন্তু আমরা না আকাশ, না মেঘ, না পাখি হতে পেরেছি। পাসপোর্ট, ভিসার দিকে তাকিয়ে দাদুর অশ্রুসিক্ত চোখ আর একবার উপলব্ধি করলাম।

কিছুক্ষণ পর আমরা বিরামপুর স্টেশনে নামলাম। দাদু কিছুক্ষণ চারপাশটা ভালো করে অবলোকন করলেন। এবারের গন্তব্য নবাবগঞ্জ। একটা অটো ধরে নবাবগঞ্জে গেলাম। নবাবগঞ্জ হতে অটো চেঞ্জ করে আরেকটা অটো কিংবা ভ্যানে করে সোজা রাঘবেন্দ্রপুর। রাঘবেন্দ্রপুর

উৎস

পৌঁছানোর একটু আগেই প্রকৃত গ্রামের আমেজ পাওয়া শুরু করেছি। কাঁচা রাস্তা, বাঁশঝাড়, বাঁশের সাঁকো এসব তখন চোখের ডগায় দৃশ্যমান। রাঘবেন্দ্রপুরে অটো থেকে নেমে আমাদের বাড়ি তখনো প্রায় আড়াই কি.মি. এর উপরে। সাধারণত ওখান থেকে কোন ভ্যান বাড়িতে আসে না। অবশ্য শ'খানেক টাকা দিলে ভ্যান ঠিকই যোগাড় হবে। টাকায় কি না হয়!

ততক্ষণে আমরা গ্রামের কাঁচা রাস্তায় নেমেছি। অটো থেকে নামার পরেই দাদু দু'চোখ বন্ধ করে নিঃশ্বাস নিলেন। তারপর বললেন, "আহা দাদুভাই; এই সোঁদা মাটির গন্ধ কতকাল পাইনি!"

দাদুকে বললাম, "একটা ভ্যানের খোঁজ করি?"

– কেন? ভ্যান কি করবে?

– আরও আড়াই কিলোমিটারের পথ...

– তাতে কি! চলো হাঁটা শুরু করি। যদিও আমার অসুবিধা নেই হাঁটতে কিন্তু নাতির অসুবিধা হলে ভ্যান নেওয়া যেতে পারে।

– আমার ও অসুবিধা নেই। আমি তো হেঁটেই যাই।

– তাহলে চলো...

কিছুদূর হাঁটার পরেই চোখে পড়লো একটি মৃতপ্রায় নদী। নদীর উপর একটি বাঁশের সাঁকো।

চৈত্রের রোদ লেগেছে পল্লীগ্রামে। বর্ষায় যৌবনবতী ঘৃলাই

উৎস

নদীটি এখন শুকিয়ে মরুভূমিতে পরিণত হয়েছে। নদীর সেই উচ্ছল ঢেউ কোথায় যেন মিলিয়ে গেছে!

এঁকেবেঁকে যে নদী চলে তার খাঁজে খাঁজে সৌন্দর্য লুকিয়ে থাকে। নদীর প্রাণ তার বুকে বহমান ঊর্মিমালা। জলের তরঙ্গায়িত সুরের মূর্ছনা যেন নদীর অলঙ্কারস্বরূপ। সেই অলঙ্কার পরিধান করে নদী ছুটে চলে দিগ্বিদিক।

পূর্ণিমার রূপোলী চাঁদের আলোয় কিংবা অস্তগামী সূর্যের আলোর ছটায় হালকা ঢেউয়ের যে সৌন্দর্য তাও মোহিত করে মনকে।

বসন ছাড়া কি দেবীমাতৃকাকে মানায়? মনের অজান্তে শ্যামাসংগীত গাইতে ইচ্ছে করে, 'বসন পরো মা, বসন পরো; পরো মাগো - বসন পরো মা...'

আমার সেই গাওয়াতে আর কি যায় আসে! আমি চাইলেই তো আর নদীকে বসন পরাতে পারিনা।

গিলে খাওয়ার সভ্যতায় নদীও নগ্ন হয়েছে; গিলে খেয়েছি তার বুকের সবটুকু জল। বছরের খানিকটা সময় নদী এখন বালুকাময় মরুভূমিতে পরিণত হয়।

নদীর ধারা নেই; কলকল শব্দ নেই - কেবল বুকের ভেতর মোচড় দেওয়া রক্তক্ষরণের বেদনা আছে। নদী যেন নিজেই নিজেকে বলছে, 'আমার একটা নদী ছিলো জানলো না তো কেউ; নদীর জল ছিলো না, কূল ছিলো না, ছিলো শুধু ঢেউ।' এ ঢেউ জলের নয় বালির।

উৎস

তবুও হারানোর এই খেলায় কখনো কখনো জোয়ার আসে; দুকূল ভাসিয়ে নিয়ে যায়। নদী ধরে রাখতে পারে না সেই বসন। কোথায় যেন হারিয়ে যায়! মুমূর্ষু নদীর বুকে আচমকা প্রাণ আসে। নদী নবরূপে সজ্জিত হয়। তার বসনে আবৃত হয় জলধারা। সেই ধারায় শরীর ভেজে কিশোরের; দস্যিপনায় মেতে থাকে ওরা। দিন তিনেক হলো জল এসেছে নদীতে। কাজল নদীর জলে; ফেলে আসা সময় খেলে যায় জীবনের খেলা; সেই খেলায় তাল দিই আমরাও। জলকেলিতে নদীর বসন আমাদের অঙ্গে ধারণ করে আমরা শুদ্ধ হয়ে উঠি।

নদীর এ বসন; কাজল জল; ভরা ঢেউ ছলছল - প্রদীপ ভাসাই অনাগত দিনগুলোকে স্মরিয়া; দুরন্ত শৈশবের কথা মনে পড়লেই আঁখি দুটি ওঠে জলে ভরিয়া।

চৈতালির মন জুড়ানো হওয়া মনকে উদাস করে দেয় প্রতি মুহূর্তে। হাতে একতারা আর গেরুয়া বসন ধারণ করলে কোন এক বাউলের মতো আমিও চিরদিনের তরে ঘরছাড়ার ডাক দিতুম। নিমিষেই হয়ে যেতুম মানুষ হতে ফকির; ফকির মানে বাউল। তোমরা যাকে ফকির বলো ফকির হওয়া কি অত সহজ? ফকিরের অন্দরের আখ্যান উপাখ্যান তোমাদের জানা নেই, তাই হয়তো এতো তাচ্ছিল্য তাদের নিয়ে... অথচ তত্ত্বচিন্তায় তোমার শিক্ষিত মগজ তার চিন্তার কূলকিনারা পায় না। এমন উদাসী হাওয়াতেও বাউল

হই না কেন; উন্মত্ততায় অধীর হই না কেন? তারও হয়তো গোপন কোন কারণ থাকতে পারে! বাউল না হওয়ার কারণ হয়তো গ্রামে এমন কিছু আছে যা বাউল মনকে পর্যন্ত বশে আনতে পেরেছে; উন্মাদ হতে পারি না, কারণ কোথাও একটা স্নিগ্ধ স্পর্শ আছে যা আমাকে চিরতরের উন্মাদ হতে দেয় না।

বাউল মনকে যিনি চিরতরের গৃহী করে তোলেন তিনি আমার মা; ওই মুখ রেখে যে বাউলের ভেক ধরছে - আমার মনে হয় সে কোনদিন ফকির হতে পারেনি। কারণ, ওই মুখকে ভুলে থাকা যায় না; পিছুটান চিন্তা করলে আবার ফকিরও হওয়া যায় না। ফলে, মা যতদিন ঘরে থাকেন, ততদিন ফকির হবার প্রয়োজন নেই। তেমনি তাঁর অপার স্নেহ আমাকে উন্মাদ হতে দেয়নি।

এমন বিষয়ের অবতারণের কারণ এই যে আমার কাছে যিনি মা তিনিই পল্লীগ্রাম। দুজনেই ধারণ করেন সন্তানকে আর দুজনেই পরম শীতলতায় ভরিয়ে তোলেন মানব জীবন।

...ক্রমশ ■

হস্তাঙ্কন

ছবির নামঃ মা দুর্গার সংসার...

শিল্পীঃ রিত্বিকা চ্যাটার্জী ✧ বয়সঃ ১৪ বছর

সবাই জানাবেন এই উদীয়মান শিল্পীর ছবিটি কেমন লাগল...

ভূতের ভাবনা

সুনৃতা রায় চৌধুরী

সেদিন সন্ধেবেলা বসে আছি চুপচাপ
ঠিক সেই সময়ে ছাদে শুনি দুপদাপ।
ব্যাপার জানতে গিয়ে ছাদে উঠে একি দেখি!
সত্যি দেখছি, নাকি চক্ষের ভুল সেকি?
মিশকালো চেহারা, মুখখানা হামদো,
লিকলিকে হাত পা, ভূত এক মামদো।
ছরকুটে দাঁত তার, চোখদুটো যেন ভাঁটা,
রকম সকম দেখে শিউরে উঠলো গাটা।
তবু বুকে বল এনে দিই এক বকুনি,
'এ ভর সন্ধেবেলা লাগিয়েছ কি শুনি?'
ভূত বলে, 'চষে দেখি কলকাতা হাওড়া
শুধু বাড়ি আর বাড়ি, গাছ কোথা শ্যাওড়া?'
আমি কই, 'লোকালয় বাড়ে দীঘে বহরে,
গাছ তুই কোথা পাবি এত বড় শহরে?
উম্পুন ঝড়ে কত গাছ হল চিৎপাত,
তার লাগি বাঁধিয়েছ এখন এ উৎপাত?
যাও চলে জঙ্গলে,গাছ কত বনময়।'
ভূত বলে, 'সেইখানে কাকে বা দেখাব ভয়?'
বলি তাকে, 'শহরের ছেলে বুড়ো আমরা,

তোদের পাই না ভয়।’ শুনে মুখ গোমড়া।
তখন বুঝিয়ে বলি, ‘পাড়া গাঁয়ে যাও চলে,
গাছ পাবে, লোক পাবে, ডরাবে যে ভূত বলে।’
ভূত বলে, ‘তাই যাই, শুধু মনে খুঁতখুঁত।’
গাঁয়ে গেলে পাছে লোকে যদি বলে গেঁয়ো ভূত!’ ■

যে প্রচলিত ভুলে করোনা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে আমাদের মাঝে।

প্রচলিত তিনটি ভুল

❌ এরা আমার সহকর্মী আমি তাদের সাথে মাস্ক ছাড়াই কথা বলতে পারি।

❌ এরা আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু তাদের সাথে মাস্ক ব্যবহার ও শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখার প্রয়োজন নেই।

❌ উনারা আমার আত্মীয়, তাদের সাথে মাস্ক ছাড়াই মেলামেশা করা যায়।

উপরের তিনটি ভুল করা থেকে বিরত থাকুন এবং সঠিক ভাবে মাস্ক পরুন, নিজে বাঁচুন ও সমাজকে রক্ষা করুণ।

গুঞ্জন পড়ুন গুঞ্জন পড়ান

আলোকচিত্র

ছবির নামঃ রাখাল...

আলোকচিত্র গ্রাহকঃ শুভাশীষ মুখার্জী

সবাই জানাবেন এই আলোকচিত্রটি কেমন লাগল...

'গুঞ্জন'এর ২০২১ এর পরবর্তী সংখ্যাগুলির বিষয়বস্তু

অগাস্ট – মৈত্রী ও স্বাধীনতা সংখ্যা

সেপ্টেম্বর – পুরানো দিনের কথা সংখ্যা

অক্টোবর – পূজা সংখ্যা

আলোকচিত্র

ছবির নামঃ সবুজের সমারোহ...

আলোকচিত্র গ্রাহকঃ শুভাশীষ মুখার্জী

সবাই জানাবেন এই আলোকচিত্রটি কেমন লাগল...

বিশেষ ঘোষণা

গুঞ্জনে প্রতি মাসের ১৫ তারিখ পর্যন্তই পরের (মাসের) সংখ্যার জন্য লেখা গ্রহণ করা হয়।

টোপ

স্বীকারোক্তি

ডঃ মালা মুখার্জী

অরুণিমা বাবার টেবিলের ওপর প্রেতচর্চা ও প্ল্যানচেট সংক্রান্ত কয়েকটি বই খোলা অবস্থায় দেখে বেশ অবাকই হল। অরুণিমা জানে, ওর বাবা অরুণাংশু চ্যাটার্জী এখনও অবধি প্রেতচর্চা নিয়ে মাথা ঘামাননি। অরুণাংশু কিচেনে কফি বানাতে গিয়েছিলেন, ফিরে এসে মেয়ের মুখে বিস্ময় দেখে হেসে বললেন, “ঘাবড়ে যাচ্ছিস তো? তোর সৌরদীপদা আমায় আবার একটি প্যাঁচালো কেসে ফাঁসিয়েছেন।” এই বলে কফিতে চুমুক দিয়ে অরুণাংশু বললেন, “আফটারলাইফ বলে একটি প্রেতচর্চাকারী গোষ্ঠীর দুজন সদস্য মারা গেছেন। এরা সবাই ব্যাঙ্ক থেকে অবসরের পর প্রেতচর্চা নিয়ে মেতেছেন।”

“তুমি আবার চোর-ডাকাত ছেড়ে ভুত-প্রেত নিয়ে পড়লে কখন?” অরুণিমা মুচকি হেসে জিজ্ঞাসা করল।

“ভুতে ধরলে যা হয় আর কি,” অরুণাংশু বললেন, “শোন তবে, সমবয়স্ক রিটায়ার্ড মানুষদের নিয়ে ফেসবুকে একটা গ্রুপ খুলেছিলেন তুষারকান্তি তালুকদার, শিগগিরি তিনি আবিষ্কার করলেন যে ষাটোর্ধ্ব মানুষদের বেশীরভাগই মরণোত্তর জীবন নিয়েই বেশী আগ্রহী। কেউ কেউ আবার

তাঁদের স্ত্রী বা প্রিয়জনদের হারিয়েছেন। এই ধরনের কয়েকজন বৃদ্ধকে নিয়ে আফটারলাইফ বলে একটি প্রেতচর্চার দল খোলেন তুষারবাবু, কিন্তু কার্যত দেখা যায় যে ফেসবুকে লিখলেও প্ল্যানচেটের আসরে উপস্থিত হওয়ার বুকের পাটা কারোরই নেই। তুষারবাবুরা চার বন্ধুতে মিলে আফটারলাইফ নামক প্রেতচর্চার দলটি খোলেন, এর ফাণ্ডিং দেন মিসেস বোস বলে এক মহিলা, যদিও তিনি কখনোই সামনে আসেননি, কিন্তু এই বিষয়ে প্রচুর বই কিনে পাঠান। তুষারকান্তি তালুকদার ছাড়াও বাকি তিনজন হলেন কুমারজীৎ রায়, সুস্নাত ঘোষ আর হিমাবন সেন। এঁরা কর্মজীবনে সহকর্মী ছিলেন, রাষ্ট্রায়াত্ত ব্যাঙ্কে কাজ করতেন। চারজনেই প্ল্যানচেট করার জন্য শনিবার তুষারবাবুর ফ্ল্যাটে জড়ো হতেন। এই রুটিনের মধ্যেই একমাস আগে ইন্দ্রজিৎ বোস বলে একজন জয়েন করেন। ইনি সিনিয়র সিটিজেন নন। ফেসবুকগ্রুপ থেকে আফটার লাইফের বিষয়ে জেনে যোগ দেন। ইনি নাকি মিডিয়ম হন। এই ইন্দ্রজিৎ যেদিন যোগ দেন, সেদিন শনিবারে প্ল্যানচেটের আসরে তুষারবাবু ঠিক করেছিলেন কোনো সেলিব্রেটি আত্মাকে ডাকবেন, কিন্তু চলে এলেন হৈমন্তী সরকার নামে এক মহিলার আত্মা। আত্মার হয়ে মিডিয়াম যখন বলে উঠল, ‘তুষারবাবু, আমায় মনে পড়ে?’ তুষারবাবু আচমকা ভয় পেয়ে যান। তুষারবাবু অসুস্থ হয়ে পড়ায় প্ল্যানচেট বন্ধ থাকে। ইন্দ্রজিৎ আর

কুমারজীৎ ওঁকে ক্যাবে করে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসে। পরদিন সকালে ওঁর বাড়ির রাঁধুনীবাবু সাড়া দিচ্ছেন না দেখে দরজা ভেঙে ঢোকার ব্যবস্থা করে। পাড়ার লোক দেখে তুষারবাবু মাটিতে পড়ে আছেন, কাপ উল্টিয়ে কফি বা কিছু পড়ে আছে কার্পেটে। পুলিশ আসে, ডাক্তারও আসে। সাধারণ কার্ডিয়াক এরেষ্ট।" অরুণাংশু এটুকু বলে একটু থামেন ।

"এতো সাধারণ মৃত্যু, বাবা। তবে সৌরদীপদা তোমায় কেন দিল?" অরুণিমা কথার মাঝখানে কথা বলায় অরুণাংশু খুশি হলেন না। "আগে সবটা শোন মন দিয়ে।" অরুণাংশু আবার বলতে শুরু করলেন, "এটা প্রথমে স্বাভাবিক মৃত্যু বলে মনে হলেও, দুদিন বাদে মানে পরশু রাতেই কুমারজীৎও হঠাৎ হার্ট অ্যাটাকে মারা যান, টিভি দেখতে দেখতে। আফটার লাইফের বাকি সদস্যদের মনে হয়েছে এটি প্রেতাত্মার কাজ। কিন্তু কোনো প্রমাণ না থাকায় পুলিশ খুনের মামলা নিতে পারছে না। কিন্তু সৌরদীপের মনে হয়েছে পরপর দুজন আফটার লাইভের সদস্যের আকস্মিক হার্ট অ্যাটাক কোনো সাধারণ ঘটনা নয়। তুই যাবি নাকি স্পটে?"

অরুণিমা তো একপায়ে খাড়া। যদিও অরুণাংশুর এভাবে তদন্ত করতে একদমই ভালো লাগে না, তবুও তাঁর পুলিশ অফিসার বন্ধুপুত্র সৌরদীপ শুনলে তো... সৌরদীপের এক

কথা, 'আঙ্কল, আপনি এক সময়ে ভারতের গোয়েন্দা বিভাগে ছিলেন, কত কেস সলভ করেছেন। আপনার এক্সপিরিয়েন্সটাই অ্যাসেট।'

ওরা যখন বেরোলো তখন ঝিরঝিরে বৃষ্টি হচ্ছে, ভ্যাপসা গরম। ভাদ্র মাসটাই এমন। অরুণিমার মনে একটা প্রশ্ন ছিল, গাড়িতেই সেটা করল। "আচ্ছা বাবা, কুমারজীৎও কি তুষারবাবুর মতো একা থাকতেন?"

"গুড কোশ্চেন।" অরুণাংশু বললেন, "তুষারবাবু বহুদিন হলো বিপত্নীক, আর বিয়ে করেননি। কিন্তু কুমারজীতের স্ত্রী আছেন, রেবতীদেবী। তিনি সেই রাতে কোনো বান্ধবীর ছেলের বিয়ে এটেণ্ড করতে যান, ফিরবেন না বলেই গিয়েছিলেন এবং কুমারজীৎও মৃত্যুর সময়ে একাই ছিলেন।"

সাউথ ক্যালকাটার একটি আবাসনের বাসিন্দা কুমারজীৎ, ছেলে বিদেশে প্রতিষ্ঠিত, মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে বিদেশেই। রেবতীদেবীই জানালেন যে তাঁর স্বামীর হার্টের রোগ বা কোনো ক্রনিক অসুখই ছিল না। ওই প্রেতচর্চাই কাল হল। কুমারজীতের মৃত্যু স্বাভাবিক মনে হলেও সৌরদীপ পোষ্টমর্টেমে বডি দিয়েছে, রেবতীদেবীও তদন্ত চান। ড্রয়িংরুমের যেখানে কুমারজীতের দেহ পাওয়া গেছে জায়গাটা দেখলেন অরুণাংশু। ধনীগৃহের ড্রয়িংরুম, দেওয়ালে দামী টিভি, দামী সোফা দিয়ে ঘেরা, দামী শো-পিস ও আসবাবপত্র, মেঝেতে পুরু কার্পেট, সুদৃশ্য পেপার-বিন।

টোপ

দেওয়ালে কুমারজীৎবাবুর ছবি, ফটোটা বোধহয় সদ্যই বাঁধিয়ে আনা হয়েছে। অরুণিমার মনে হল একটা গ্রুপ ফটো থেকে কাটা, অরিজিনাল ছবিটা পেলে ভালো হত। অরুণিমা ভাবল এটা জিজ্ঞেস করলে কি রেবতীদেবী রাগ করবেন?

রেবতীদেবী অরুণাংশু বাবুকে দেখালেন একটা কোণে সোফাটা টিভির অপজিটে রাখা, ওটাতেই দেহটা ছিল, পাশের টেবিলে দুটো কাপ, তলানি ব্ল্যাক কফি। অরুণিমা দেখল সোফাসেটের বাম পাশে একটা পেপারবিন, সেখানে কিছু রূপালি ওষুধের পাতা।

"দুটো কাপ? কেউ এসেছিল?" অরুণাংশুবাবু পলিথিনে মোড়া কাপদুটো দেখলেন, বোনচায়নার কাপ। একটার গায়ে ও ভিতরে কফি লেগে আছে, অন্যটার গায়ে কোনো দাগ নেই।

"উনি কফি একটু বেশীই খেতেন, আর কাপ কখনো সরাতেন না। ওটা যেন অলিখিতভাবে আমার কাজ।" রেবতীদেবী অনুযোগের সুরে বললেন।

"টিভি খোলা ছিল?" অরুণাংশু অন্য পয়েন্টে এলেন।

"হ্যাঁ, টিভি অন ছিল," রেবতীদেবী বললেন।

"কোন চ্যানেল চলছিল, আন্টি?" অরুণিমার প্রশ্নে ভদ্রমহিলা বিরক্ত হলেও বললেন, "আমি দেখেছি ব্ল্যাক স্ক্রিন, তবে টিভি অন ছিল। তুমিও কি পুলিশ বিভাগে কাজ করো?"

“মাফ করবেন, ও আমার মেয়ে। ওর এক জায়গায় যাওয়ার ছিল তাই সঙ্গে এনেছি,” বাবা ওকে সহকারী হিসেবে গুরুত্ব দিলেন না দেখে অরুণিমার চোখে জল এল। ছবির বিষয়টি আর না তোলাই ভালো।

“আপনি তুষারবাবু, সুস্নাতবাবু আর হিমাবনবাবুকে চিনতেন?”

“কেন চিনবো না? ওঁরা একই ব্যাঙ্কে কাজ করতেন, তিনজনেই গত পাঁচবছরের মধ্যে অবসর নিয়েছেন। উত্তর কলকাতার দিকে মুকুন্দপুর ব্রাঞ্চে ওনারা একসাথে পাঁচ বছর কাজ করেছেন। তখনই অফিস পিকনিকে ওঁদের সাথে দেখা হয়েছে। এখনও যাতায়াত করেন।” রেবতী দেবী বললেন।

“ঠিক কোন সময়ে এক সঙ্গে কাজ করেছেন?”

“১৯৯৪ থেকে ১৯৯৯ সাল,”রেবতীদেবী একটু চিন্তা করে বললেন।

এখন ২০১৯, মানে আজ থেকে কুড়ি-পঁচিশ বছর আগে, অরুণিমা ভাবল।

“আপনি ওঁদের পরিবারদের চেনেন? তুষার বাবুর ওয়াইফকে?”

“জানবো না? কনকলতা খুব ভালো মেয়ে ছিল, কিন্তু বরের ওপর রাগ করে বিষ খেল। সন্দেহ করত যে ওর স্বামীর অ্যাফেয়ার আছে। কানাঘুষো শুনেছিলাম, ব্যাঙ্কে

একটি বড়লোকের মেয়ে আসত, প্রচুর সম্পত্তির মালকিন। মকুন্দপুরের ব্যাবসায়ী বাড়ির মেয়ে নাকি। কনক বড়ই সন্দেহপ্রবণ ছিল, নইলে তুষারবাবুর অ্যাফেয়ার থাকলে উনি কি আর বিয়ে করতেন না?" রেবতীদেবী আরও জানালেন সুস্নাত আর হিমবানের পরিবারেও বউ ছেলে-মেয়ে সব থাকলেও, কলকাতায় শুধুই কর্তা-গিন্নী থাকেন, সন্তানরা ভিনরাজ্যে বা ভিনদেশে সেটেলড। একাকিত্ব কাটানোর জন্যই এই প্রেতচর্চা। অবশ্য ইন্দ্রজিতের নাম উনি জীবনেও শোনেননি। অরুণিমা ভাবল এই ইন্দ্রজিতের সাথে মিসেস বোসের কানেকশন নেই তো? অবশ্য তাঁকে কেউই সামনাসামনি দেখেনি।

অরুণিমা টিভিটা দেখছিল, খুব দামী ব্র্যাণ্ড। হঠাৎ পায়ের নীচে খচ করে কি একটা লাগল। অরুণিমা দেখল একটা লাল রঙের পেনড্রাইভ টিভির নীচে পড়ে আছে। রেবতীদেবী অবশ্য পেনড্রাইভটি চিনলেন না, শুধু বললেন, "এই গ্রুপের সদস্যরা সপ্তাহে একবার মিট করলেও প্রতিদিন একটি করে ভূতের মুভি দেখত। দেশী-বিদেশী সবরকম। এর জন্য অবশ্যই পেনড্রাইভ চালাচালি হতো। অরুণাংশু পেনড্রাইভটি নিলেন। এটা কি করে পুলিশের চোখ এড়িয়ে গেল?

এরপর সুস্নাতবাবুর বাড়ি যাওয়া হল। ইনিও একটি অভিজাত আবাসনে থাকেন। তবে তুষারবাবু আর তাঁর স্ত্রীর বিষয়ে মুখ খুললেন না, নিজের স্ত্রী কুমকুমকেও কথা বলতে

দিলেন না। কুমকুমদেবী শুধুমাত্র চা-বিস্কুট দিতে এলেন। সুস্নাতও ইন্দ্রজিতকে চেনেন না, ইন্দ্রজিৎ প্ল্যানচেটে মিডিয়াম হয় কথাটা তুষারই বলেছিল। ইন্দ্রজিতের কোনো ছবি ইত্যাদিও নেই, এমনকি ফেসবুক প্রোফাইলও লকড আর সেখানে ছবির মানুষের বদলে মেঘের ছবি। নীল আকাশের ব্যাকগ্রাউণ্ডে সাদা মেঘ। সুস্নাত দেখালেন ফোনে।

"আসলে কি জানেন, পুরো জীবনটাই তো হিসেব-নিকেশে কেটে গেল। তাই আমরা ভেবেছিলাম আত্মা আছে কি নেই এই বিষয়ে চর্চা করি। কি জানেন তো, বিদেশে বহু এক্সিপেরিমেন্ট হয়েছে, দেখা গেছে যে যেসব মানুষ বৃদ্ধবয়সে স্বাভাবিকভাবে মারা যায় তাঁরা আর ফেরেন না। কিন্তু আত্মঘাতী বা অপঘাতে মৃত আত্মারা পৃথিবীতে অতৃপ্ত ইচ্ছে নিয়ে তাদের নির্ধারিত আয়ুকাল অবধি এই ধরাধামেই ঘোরেন। এমনই আত্মাদের প্ল্যানচেটে ডাকা হয়। আমরা এতদিন সাকসেসফুল হইনি, তাই তুষার বলল যে একজন উপযুক্ত মিডিয়মের অভাবে প্ল্যানচেট সাকসেসফুল হচ্ছে না। আমরা এ বিষয়ে অনেক বই পড়েছি, মুভি দেখেছি। তাই ও ফেসবুকে লিখেছিল, যদি কেউ মিডিয়ম হতে চায়। ইন্দ্রজিৎ নাকি ইনবক্সে যোগাযোগ করেছিল। এই মেম্বারটি সম্বন্ধে আমি কিছুই জানি না। আমার তো দুশ্চিন্তায় অনিদ্রারোগ হয়ে গেছে, দেখুন ঘুমের পিল খাই নিয়মিত" সুস্নাতবাবু ওষুধের পাতা দেখালেন অরুণাংশুকে।

অরুণিমা সুস্নাতবাবুর গল্প না শুনে ড্রয়িংরুমটা খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। দেওয়ালে একটা গ্রুপফটো, অরুণিমা কুমারজীত আর সুস্নাতকে চিনল, গ্রুপের সামনে মহিলারা, ওই তো কুমকুমদেবী আর রেবতীদেবী, আরও একজন। অরুণিমার কৌতুহল দেখে অরুণাংশুই জিজ্ঞেস করলেন, "ফটোটা কি পিকনিকের?"

"হ্যাঁ, গঙ্গার ধারের একটা বাগানবাড়ি," সুস্নাত বললেন।

"আপনারা সবাই আছেন এতে, মানে আফটারলাইফের মেম্বাররা? ছবিটা কবেকার?"

"১৯৯৫ সালের ডিসেম্বর মাসের, এই দেখুন," বলে উৎসাহের সঙ্গে সুস্নাত কুমারজীৎ, তুষার আর হিমাবনকে চেনালেন। কুমারজীতের কাঁধে তুষারবাবু হাত দিয়ে আছেন, এই ফটোটাই কুমারজীৎবাবুর দেওয়ালে এনলার্জড ভাবে ছিল। অরুণাংশু মহিলাদেরও চিনতে চাইলেন, "এই তৃতীয়জন কে? তুষারবাবুর স্ত্রী?"

সুস্নাত ঘাড় নেড়ে না বললেন। অরুণাংশু কিন্তু ছাড়লেন না, "তবে ইনি কে? কোনো কলিগ?"

সুস্নাত দীর্ঘ্যশ্বাস ফেললেন, "হৈমন্তী সরকার। ব্যাঙ্কে আসতেন, বড়লোকের অবিবাহিত মেয়ে, সুন্দরী। ইয়ংটাইমে বাপ-মা মারা যাওয়ায় জ্ঞাতিরা সম্পত্তি হাতানোর চেষ্টা করেছিল। তুষার ওকে হেল্প করেছিল। ইনিই ওই স্পটটা ঠিক করে দিয়েছিলেন। এইটা ওঁর পৈতৃক বাগানবাড়ি।

আমরা শুধু দুজন ফ্যমিলি নিয়ে গিয়েছিলাম। তুষার বউ নিয়ে যায়নি, আর হিমাবনের তখনও বিয়ে হয়নি...”

“হুম, হৈমন্তী সরকার! ইনিই তো প্ল্যানচেটে এসেছিলেন, তাই না?”

অরুণাংশুর কথায় সুস্নাত হোঁচট খেলেন মনে হল, “হৈমন্তী যে মারা গেছে তাই জানতাম না।”

“আচ্ছা, তুষারবাবুর স্ত্রীর সাথে ওনার সম্পর্ক কেমন ছিল?”

“তুষারের স্ত্রী কনক সন্দেহপ্রবন ছিল। ওদের সন্তানাদি না হওয়ায় সমস্যা ছিলই। এটা ঠিকই যে হৈমন্তীর বিষয়ে তুষার দুর্বল ছিল। একবার হৈমন্তীর জন্মদিনে সোনার গয়নার সেট দেয় তুষার। তাতেই পরিবারের সন্দেহ হয়, কনক-বউদি সুসাইড করেন।”

“হৈমন্তীদেবীর কি হলো?”

“হৈমন্তীদেবীর বাড়ির লোকেরা ওঁর অন্যত্র বিয়ে ঠিক করেন। খুব বড় ব্যবসায়ী পরিবারে। সেই বিয়েতে তুষার যায়নি। এরপর ব্যাঙ্কে ওঁদের কর্মচারীরা আসত, উনি নন।” সুস্নাত হাতজোড় করে বললেন, “দেখুন, আমরা সবাই নেহাতই ছাপোষা মানুষ। নিছকই শখে এসব করতাম। আর হৈমন্তীর সাথে কোনো অন্যায়ই আমরা করিনি, যৌবনে এসব হয়....”

“দেখুন সুস্নাতবাবু, কিছু বিষয় তো আছেই, তাই না?”

অরুণাংশু বললেন।

"আচ্ছা, যেহেতু আপনাদের সব সন্দেহই ইন্দ্রজিতের বিরুদ্ধে যাচ্ছে, আর দুটো মৃত্যুই হয়েছে বাড়িতে কেউ না থাকাকালীন, তাই জানতে চাই ইন্দ্রজিতবাবু অল্প সময়ে কতটা ঘনিষ্ঠ হয়েছিলেন আপনাদের সাথে? মানে আপনাদের রুটিন জানতেন?"

"তুষার একা থাকতো ইন্দ্রজিৎ জানত, কিন্তু কুমারজীতের স্ত্রী বিয়েবাড়ি যাবে এটা কিভাবে জানবে? সেই প্ল্যনচেটের রাতের পর আর আমাদের সঙ্গে ওর কোনো যোগাযোগ নেই।" সুস্নাত বললেন। এরপর অরুণাংশু সুস্নাতকে ধন্যবাদ জানিয়ে বেরিয়ে এলেন। দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়ে আসছে, বাবা-মেয়ের এখনো খাওয়া হয়নি। অরুণাংশু বাইরে খাওয়া পছন্দ করেন না, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে এসব কন্ট্রোল করা উচিত। তাই অরুণাংশু গাড়ি ঘোরালেন ওঁর লেকটাউনের বাড়ির দিকে।

"ইন্দ্রজিতই কালপ্রিট কি বলো? ওর আসল নাম বোধহয় এটা নয়। প্রোফাইলেও কেমন মেঘের ছবি?" অরুণিমা বলল।

"হুম, মেঘের সাথে ইন্দ্রজিতের একটা সম্পর্ক আছে, নারে?" অরুণাংশু হাসলেন। কেতকিমাসি রেঁধে রেখেছিলেন। খাওয়া-দাওয়ার পর অরুণাংশু মেয়েকে বললেন পেন ড্রাইভটা লাগাতে।

টোপ

পেনড্রাইভে একটা ছোট্ট পঁয়তাল্লিশ মিনিটের মুভি রয়েছে। অরুণিমা ভেবেছিল কোনো বিদেশী হরর মুভি হবে কিন্তু তা নয়। মুভিটি নিছকই বাংলা ফিল্ম, নব্বইয়ের দশকে এক ব্যাঙ্ককর্মী তার অসুখী দাম্পত্যজীবন থেকে মুক্তি পেতে বড়লোকের মেয়ের সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে। লোকটি যখন স্ত্রীকে ডিভোর্স দিয়ে এল, মেয়েটি নিজের বহুমূল্য এনগেজমেন্ট রিং দেখিয়ে বলে এত দামী উপহার যে দিতে পারবে সেই তার হাজব্যাণ্ড হতে পারে। লোকটির জেদ চেপে যায়। ঠিক সেদিনই ব্যাঙ্কের এক মিনি ডিপোজিটর তার সারা সপ্তাহের কালেকশন জমা করতে আসে। লোকটির থেকে টাকাটা নিলেও পরে এন্ট্রি করবে বলে রেখে দিল, আদৌ এন্ট্রি না করে সেই টাকা দিয়ে একটি বহুমূল্য গয়না নিয়ে প্রেমিকার বাড়ি গেল। আর অনায়াসে মিনি ডিপোজিটরটি টাকা ফ্রডের অভিযোগে অভিযুক্ত হল। আরও তিনজন সহকর্মী মিনি ডিপোজিটারটির বিরুদ্ধেই সাক্ষ্য দিল। সে বাড়ি বন্ধক রেখে টাকা শোধ করে আত্মহত্যা করল, কিন্তু যে তাকে ফাঁসিয়েছিল তার কিছুই হল না। আত্মঘাতী লোকটির আত্মা একটি মিডিয়ম খুঁজছে একথা বলার জন্য। মুভিটি এখানেই শেষ।

অরুণাংশু ভিডিওটা অফ করেই বেরিয়ে গেলেন, মেয়েকে এবার আর নিলেন না। "তোর পড়াশোনা নেই?" এমন একটা কেসের মধ্যে পড়াশোনার কথা শুনে অরুণিমা প্রীত

হল না, কিন্তু বাবা বললেন, "তুই ফোন করে সুস্নাতবাবুকে বলিস কোনো অবস্থাতেই যেন উনি একা না থাকেন, আর কলকাতা না ছাড়েন। কখোনো একা থাকলে যেন হিমাবনবাবুকেও ডেকে নেন।"

"তুমি কোথায় যাচ্ছ?"

"মুকুন্দপুর ব্রাঞ্চে, কিছু তথ্য জানার আছে।" অরুণাংশু এটুকু বলেই বেরিয়ে গেলেন। অরুণিমা বাবার কথা মতো কাজ করলেও ওর মন পড়ায় আজ আর বসবে না। তবুও বই নিয়ে বসল অরুণিমা। বাবা দুটো ইমপর্টেন্ট পয়েন্ট ছেড়ে দিলেন, ভাবল অরুণিমা, এক, হিমাবনবাবুর বাড়ি যাওয়া হল না, দুই, আফটার লাইফের পৃষ্ঠপোষক মিসেস বোসকে নিয়েও বাবা মাথা ঘামালেন না। পয়েন্ট দুটো নোট করে নিল অরুণিমা, পরে কাজে লাগবে।

ঠিক রাত দশটা নাগাদ সুস্নাতবাবু ফোন করলেন, ওঁর স্ত্রীকে দুর্গাপুর যেতে হবে। বড় শ্যালকের শরীর খারাপ, কেউ খবর দিয়েছে । অরুণাংশুবাবু মানা করেছেন তাই উনি যাননি, চেনা গাড়িতে স্ত্রীকে দুর্গাপুর পাঠিয়ে দিয়েছেন। এদিকে হিমাবনও আসতে পারবে না, ও আদৌ কলকাতায় নেই। "এখন মা, অরুণিমা, তুমিই প্লিজ সৌরদীবাবু বা অরুণাংশুবাবুকে বলো পুলিশ পোষ্টিংয়ের জন্য।"

অরুণিমা বাবাকে ফোনে পেল না, কিন্তু সৌরদীপকে পেল। সৌরদীপ অরুণিমাকে নিতেই লেকটাউনে চলে এল,

"আঙ্কল রহস্যটার প্রায় সমাধান করে ফেলেছেন। মেঘের আড়ালে থাকা মেঘনাদ ওরফে ইন্দ্রজিতকে পাওয়া গেছে। আর রহস্য উন্মোচনের শেষ পর্যায়ে তুমি থাকবে না, হয়?"

কি যে আনন্দ হল অরুণিমার। সৌরদীপদা অন্তত ওর কথা মনে রেখেছে। সৌরদীপের বাইক ছুটল রাতের কলকাতার রাস্তা ধরে। যেতে যেতেই সৌরদীপ বলল, "যেরকম ভিডিও তুমি দুপুরে দেখেছ, ঠিক সেইরকম ঘটনা মুকুন্দপুর ব্রাঞ্চে ঘটেছিল। নিজের ক্ষমতার বাইরে গিয়ে উপহার দেওয়ার জন্য তুষারবাবু আর তাঁর বন্ধুরা এক মিনিডিপোজিটারকে ফাঁসিয়েছিলেন। মিনি ডিপোজিটররা স্থায়ী ব্যাঙ্ক কর্মী হতেন না। ছোট ছোট ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে টাকা কালেক্ট করে তাদের নামে ব্যাঙ্কে দিতেন। তেমনই একজন ছিলেন সুরজিত সামন্ত, খুব খেটে মিনি ডিপোজিটরের কাজ করতেন, জীবনে স্বপ্ন ছিল ছেলেকে সায়েনটিস্ট বানাবেন। ছেলের নামও রেখে ছিলেন বিশ্ব বিখ্যাত সায়েন্টিস্ট মেঘনাদ সাহার নামে। তুষারবাবুর ষড়যন্ত্রে পরিবারটি পথে বসে।"

"মেঘনাদ সামন্তই ইন্দ্রজিৎ?" তাই বাবা বলেছিলেন মেঘের সাথে ইন্দ্রজিতের গভীর সম্পর্ক! কিন্তু বাবা লোকটাকে ধরলেন কিভাবে? সেটা নাকি বাবাই জানেন। ওরা যখন সুস্নাতবাবুর বাড়ির সামনে পৌঁছলো তখন রাত বেশ নিঃঝুম হয়ে গেছে, তায় ঝিরঝিরে বৃষ্টি পড়ছে। ধনী

এলাকার সেক্টরগুলো এই সময়ে একেবারে নিঃস্তবব্ধ হয়ে যায়। শুধু কয়েকটা সারমেয় জেগে আছে। পুলিশের একটা জিপ কিছুটা দুরে দাঁড়িয়ে আছে। অরুণিমারাও ওদিকেই গেল। গাড়িতে বাবা রয়েছেন, অরুণাংশু ইশারায় মেয়েকে চুপ করতে বললেন। ওঁর পাশে একজন বছর ত্রিশ-পঁয়ত্রিশের যুবক, মাথা নীচু করে বসে আছে। কিন্তু লোকটির হাতে হাতকড়া নেই। এ কি ইন্দ্রজিৎ, না অন্য কেউ? কিছুক্ষণের মধ্যেই আবাসনের গেটে একজন রেইনকোট পরা মানুষ এলেন, গার্ড তাঁকে বিনা প্রশ্নে ঢুকতে দিল। লোকটি কিছু বলতে গার্ড মাথা নাড়লো। কিছুক্ষণের মধ্যেই একটি ক্যাব এল। ক্যাব থেকে যিনি নামলেন তিনি হিমাবনবাবু, অরুণিমা এর বাড়ি না গেলেও ছবি দেখেছে।

"অরুণিমা, কুইক," ওঁরা ভিতরে যাওয়ার পাঁচ মিনিটের মধ্যেই অরুণাংশু পুলিশের জিপ থেকে নামলেন, যুবকটিকেও নামতে বললেন, "তোমায় ঠিক যেটা করতে বলেছি সেটাই করবে। এই স্বীকারোক্তির বড়ই প্রয়োজন।"

"রেইনকোট পরা লোকটি কে চিনলে, অরুণিমা? সুস্নাতবাবু।" সৌরদীপ ফিসফিসিয়ে বলতেই অরুণাংশু বিরক্ত হলেন। এমন সময়ে কথা বলা বিপজ্জনক, কনসানট্রেশনও নষ্ট হয়।

আবাসনের গার্ডটি সৌরদীপকে দেখে ওঁদের ছেড়ে দিল,

দুজন কনস্টেবল লক্ষ্য রাখলো যেন গার্ডটি ওপরে খবর না দিতে পারে। ওরা লিফ্ট নিলো না, ফায়ার এসকেপের সিঁড়ি ব্যবহার করে উপরে এল, কিন্তু ইন্দ্রজিৎ লিফ্টেই উঠল। ইন্দ্রজিৎ ফোনের রেকর্ডার অন করেছে, ওখানে যা কথা হবে সৌরদীপের ফোনেও সেগুলি আসবে। ওরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে লাগল।

ইন্দ্রজিৎ কলিংবেল টিপতেই সুস্নাতর গলা পাওয়া গেল, "এসো ইন্দ্রজিৎ। তোমার কথামতো টাকার বন্দোবস্ত হয়ে গেছে, এটা নাও আর কেটে পড়ো। এই শহরে আর যেন তোমায় না দেখি..."

"কি যে বলেন? অতীতের কলঙ্ক ঢাকতে মাত্র ত্রিশ হাজার, লাখখানেক ঝাড়ুন, আঙ্কল।" ইন্দ্রজিতের কথায় হিমাবন উত্তেজিত হয়ে বলে, "আর এক পয়সাও বেশী নয়। কি ভেবেছটা কি? তুষারের ভীমরতি হয়েছিল, আমরা কেন খেসারত দেবো?"

"সেদিন আমার বাবাকে প্ল্যান করে ফাঁসিয়েছিলেন, কেন? উনি কি ক্ষতি করেছিলেন আপনাদের?"

"এসব তোমার অ্যালিগেশন, কি প্রমান আছে তোমার কাছে?" হিমাবন জিজ্ঞেস করেন, "সেদিনও কেউ দেখেনি সুরজিতকে টাকা জমা করতে, আজও কিছুই প্রমান নেই।"

ইন্দ্রজিৎ বলল, "আমার কাছে তুষারবাবুর স্বীকারোক্তি আছে। রেকর্ডেড!"

"ওই রেকর্ডিংটা দাও আর টাকাটা নিয়ে বিদায় হও..." সুস্নাত বললেন।

ইন্দ্রজিৎ কিছুক্ষণ চুপ রইল, তারপর সুস্নাতর গলা শোনা গেল, "এই পেন ড্রাইভটা?"

"হ্যাঁ, টাকাটা দিন..."

"আর কোনোই প্রমান রইল না যে আমরাও সুরজিত সামন্তকে ফাঁসানোর ব্যাপারে ইনভলভড ছিলাম।" হিমবান নিশ্চিন্ত হয়ে বলল, "পেনড্রাইভের কন্টেন্টটা নষ্ট করে দেওয়া উচিত।"

"কি হল দাঁড়িয়ে আছ কেন?" সুস্নাত রাগত স্বরে বললেন।

"আমি তো তুষারবাবুর স্বীকারোক্তিটা দিলাম, কিন্তু, কুমারজীৎবাবুর মৃত্যুতেও যে পুলিশ আমাকেই সন্দেহ করছে। তার কি হবে?"

"যেমন আমাদের সবাইকে ভয় দেখানো ঠিক হয়েছে! কুমারজীতের ফ্ল্যাটে সেদিন আমি গিয়েছিলাম, কিন্তু সন্দেহটা লোকে তোমাকেই করবে। যাইহোক, বাবাও জেলে পচে মরেছিল, তুমিও মরো।" সুস্নাত হিমাবনকে বলল, "সৌরদীপবাবু নীচেই আছেন। খবর দাও তো। ছেলেটা ব্ল্যাকমেইল করে টাকা নিয়ে যাচ্ছে।"

সৌরদীপ তৈরীই ছিল, ডোরবেল বাজাতেই সুস্নাত দরজাটা খুললেন। হিমাবন ইন্দ্রজিতকে ধরে রেখেছে। এ

বয়সেও হিমাবন বেশ হাট্টাকাট্টা। সৌরদীপকে দেখে উৎসাহিত হয়ে সুস্নাত বললেন, "দেখুন, এই সেই ব্যক্তি, যে প্ল্যানচেটের আসরে গলা ভাঁড়িয়ে আমাদের ভয় দেখিয়েছিল, কুমার আর তুষারকে ভয় দেখিয়েছে, কুমারকে খুনও করেছে আর এখন আমাদের ব্ল্যাকমেইল করছে..."

"তাই তো আপনি নিজেই স্ত্রীকে দুর্গাপুরে পাঠিয়ে ওকে ব্ল্যাকমেইল করার সুযোগটা দিলেন," সৌরদীপের মুখে এমন কথা শুনে সুস্নাত কিঞ্চিৎ ঘাবড়ে গেল।

"প্রবলেমটা হলো এই যে ইন্দ্রজিৎ পেনড্রাইভটা আপনাদের দেওয়ার আগেই ওটা পুলিশের হাতে পড়ে যায়, সুস্নাতবাবু..." অরুণাংশু ঘরে ঢুকলেন, তাঁর কথায় যেন ঘরে বাজ পড়ল। দুজন প্রৌঢ়ের মুখেই স্বেদচিহ্ন, এসিতেও ঘাম জমছে।

"কুড়িবছর আগে মুকুন্দপুর ব্রাঞ্চে যে ফ্রড হয়েছিল তারজন্য সুরজিত সামন্তের জেল হলেও টাকাটা পাওয়া যায়নি। সেসময়ে হঠাৎ করে তুষারবাবুর দামী গয়না কেনা, আপনাদের হঠাৎ বড়লোক হয়ে যাওয়া, সবকিছুই অন্য কিছু ইঙ্গিত করে। তবে কি জানেন, প্রমান ছিল না।" অরুণাংশুর কথায় ধপ করে সোফায় বসে পড়লেন সুস্নাত ।

"লোভ, লোভে পড়ে করেছিলাম। সুরজিত ছেলেটা সৎ ও পরিশ্রমী ছিল, কিন্তু চরিত্রবান। হৈমন্তী ব্যাঙ্কে আসত, তুষারের সাথে ওখানেই আলাপ, মেয়েটা জানতই না যে

তুষার বিবাহিত। হৈমন্তীও তুষারকেই ভালোবাসত। ওর ফ্যামিলি থেকে বিয়ে ঠিক হলেও হৈমন্তী সেটা ভেঙে দিতে চায়। ঠিক এই সময়েই সুরজিত হৈমন্তীকে জানিয়ে দেয় কনকবৌদির বিষয়ে। হৈমন্তী সরে আসতে চায় আর তুষারের সব রাগ পড়ে সুরজিতের ওপর...”

“শুধু তুষারের না আপনাদেরও?” অরুণাংশু জিজ্ঞেস করলেন, “আমি মুকুন্দপুর ব্রাঞ্চে গিয়ে কাল কেসফাইল ওপেন করেছি, ওইসময়ে কাজ করেছে এমন দু-একজনকেও পেয়েছি। আপনারা চারজনই হৈমন্তীদেবীর থেকে অনেক কৃপাপ্রসাদ পেতেন, তুষার একা নয়। হৈমন্তীদেবী নানান দামী গিফ্ট দিতেন, পিকনিকের জন্য ফ্রি বাগানবাড়ি, কি তাই তো? এমন মুরগী আপনাদের হাতছাড়া হয়ে যাবে, তাই তো?” অরুণাংশুর কথায় দুই প্রৌঢ় চুপ রইলেন। “কি ইন্দ্রজিৎ, তোমার বাবা কেন অকারণে ফাঁসলেন শুনলে তো?” ছেলেটির মুখের চোয়াল শক্ত হল।

“এবার শুনুন, সুরজিতের জেল হলে সংসারটা ভেসে যায়, তারপর কি হয়, ইন্দ্রজিৎ?” অরুণাংশু ইন্দ্রজিতের কাঁধে হাত দিলেন।

ইন্দ্রজিতের চোখ জ্বলছে, “বাবার অনেক স্বপ্ন ছিল আমায় নিয়ে, সেগুলো ভেঙে যায়। মা লোকের বাড়ি কাজ করতেন, চোরের বউ বলে কেউ কাজও দিত না। আমি অনেক কষ্টে দাঁড়িয়েছি, বোস মেডিসিন কোম্পানিতে কাজ

করি এখন। ফেসবুকে এঁদের সঙ্গে আলাপটা কাকতালীয়, কিন্তু তুষারবাবুর সাথে ঘনিষ্ঠতা বাড়তেই জানতে পারি উনিও মুকুন্দপুরের ওই ব্যাঙ্কে কাজ করতেন। ফেসবুকে সারনেমটা ছিল না, ইচ্ছে করে মালিকের পদবী নিই। প্ল্যানচেটে মহিলার গলা নকল করি...”

“তুষারবাবুর তো হৈমন্তীর গলা চেনা উচিত...” অরুণিমার কথায় ইন্দ্রজিৎ এতক্ষণে ওকে লক্ষ্য করল, “ম্যাডাম, এত বছর বাদে হৈমন্তী নামটাই যথেষ্ট ছিল, গলাটা নয়। তাছাড়া হৈমন্তীদেবী আছেন কি নেই তাও আমি জানি না, কিন্তু তুষারবাবু অসুস্থ হয়ে পড়েন। আমি আর কুমারজীত ওঁকে ছাড়তে যাই। আমি যখন ডাক্তার ডাকতে যাচ্ছি, কুমারজীতবাবু হঠাৎই বললেন ওঁর একটু কফি না হলে হবে না, মাথা ধরে গেছে। বন্ধুর গৃহে এর আগেও উনি কফি বানিয়ে খেয়েছেন, সেদিনও গেলেন। ঠিক তখনই তুষারবাবু বিড়বিড় করে বলেন, ‘হৈমন্তী আমার জীবনে পাপ, ওর মোহে কনককে বিষ খাইয়েছি, সুরজিতকে ফাঁসিয়েছি। আজ আবার কেন এলে হৈমন্তী, আমায় নরকে নিয়ে যেতে?’ আমি সেদিন কথাগুলো রেকর্ড করতে পারিনি, কুমারজীৎ কিচেন থেকে এসে গেলেন। উনি বললেন ডক্টরের সাথে কথা হলো? আমি যে ফোন করিনি সেটা বলিনি, আমি নিজে থেকেই ওষুধ সাজেস্ট করলাম...”

ইন্দ্রজিতের কথার খেই ধরে অরুণাংশু বাবু বলে উঠলেন,

"আর সেটা এমন ওষুধ যাতে ওঁর বিপি বেড়ে যায়। ওঁকে অসুস্থ করে স্বীকারোক্তি পুনরায় নিতে চান, বাট হি পাসড অ্যাওয়ে। তখন আপনি বাকি তিনজনকে ব্ল্যাকমেল করতে থাকেন যে তুষারবাবুর স্বীকারোক্তি আপনার কাছে আছে। কুমারজীৎবাবুকে লাল পেন ড্রাইভটি দেন, কিন্তু ওতে ছিল একটা শর্টফিল্ম..."

"ওই শর্টফিল্মটি আমার বন্ধুকে দিয়ে বানানো, ঠিক কুড়ি বছর আগে যা হয়েছিল তাইই নিয়ে। ওটা দেখে কুমারজীৎবাবু আমায় গালাগাল দেন, এটা তো কারও স্বীকারোক্তিও নয়, উনি আমায় বলেন ব্যবস্থা নেবেন আমার বিরুদ্ধে আর সেদিনই উনিও মারা যান বোধহয় হার্ট অ্যাটাকে," ইন্দ্রজিতের কথায় অরুণাংশু হাসেন।

"এতই সোজা? কুমারজীৎবাবুর স্ত্রীই বলেছেন যে ওনার কোনো হার্টের প্রবলেম ছিল না। কি সুস্নাতবাবু, আপনি বলবেন না আমি? অবশ্য একটু আগেই আপনি বলেছেন যে আপনিই কুমারজীতের কাছে যান। আর বন্ধুর ফ্ল্যাটে আপনি এতবার যেতেন যে গার্ডও আপনাকে নোটিশ করেনি।"

আর অস্বীকারের জায়গা নেই, সুস্নাতবাবুও স্বীকার করলেন যে উনি গিয়েছিলেন। কুমারজীতের সাথে বসে শর্টফিল্মটিও দেখেন, কুমারজীত খুব নার্ভাস হয় বলেছিলেন যে আমাদের বয়স হয়েছে। দু'দিন বাদে ওপরওলাকে কি জবাব দেব? সুরজিতের ছেলে মেঘনাদ ওরফে ইন্দ্রজিতের

সাথে একটা মিটমাট করা ভালো। দোষ স্বীকার করলে পাপের বোঝা কমবে। আর তখনই কুমারজীতকে প্রতিহত করতে ঘুমের বড়ি মিশিয়ে দেন সুস্নাত। সন্দেহের তীর ইন্দ্রজিতের দিকেই ঘোরান, কিন্তু নিজের অজান্তেই একটি মোক্ষম সূত্র অরুণাংশুর হাতে তুলে দেন। তুষারকে না হয় ইন্দ্রজিৎ বাড়িতে ছাড়তে গিয়েছিল, কিন্তু কুমারজীতের স্ত্রী কবে বিয়ে বাড়ি যাবেন সেটা ও জানবে কি করে? এখানেই খটকা লাগে অরুণাংশুর, তার মানে ঘনিষ্ঠ কেউই কুমারজীতবাবুর কাছে আসেন। এবার রেবতীদেবী বললেন দু'কাপ কফি ও একাই খেয়েছে, কেউ একসাথে দুটো বোনচায়নার কাপ নিয়ে বসে না, অর্থাৎ কেউ এসেছিল আর রেবতীদেবী সেটা আড়াল করলেন। তায় একটা কাপের ভিতর ও বাইরে কফি লেগে, একটার বাইরেটা পরিষ্কার, কিন্তু ভিতরে কফি, অর্থাৎ খাবার পর বাইরেটা সাফ করা হয় ফিঙ্গারপ্রিন্টের কথা ভেবেই।

"আমি জানি না বন্ধুপত্নীর সাথে আপনার সমীকরণটা ঠিক কি, তবে আপনার স্লিপিং পিলের পাতাই আপনাকে ডোবালো। কুমারজীতের ড্রয়িংরুমের পেপারবিনেও সেম ওষুধের স্ট্রিপ, যেটা আপনি আগ বাড়িয়ে আমায় দেখালেন। যাই হোক, ইন্দ্রজিতকে দিয়ে আজকের টোপটা আমিই ফেলেছিলাম, সৌরদীপের লোকেরা ওকে ভাড়াবাড়ি থেকে তুলে আনে। আমি জানতাম আপনাদের অপর

ক্রাইম পার্টনার হিমাবনও ঠিকই আসবেন। এনিওয়ে, আইন বাকি কথা বলবে। আর আমি বলবো ইন্দ্রজিৎ, যদি তোমার শাস্তি হয়ও তবু আর কখনো আইন নিজের হাতে নিও না। চলি সৌরদীপ?"

রাত প্রায় দেড়টা যখন অরুণাংশুর গাড়ি লেকটাউনে ফিরল। অরুণিমা জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা বাবা, যদি এনারা প্রেতচর্চার দলটা না খুলতেন তাহলে তো ইন্দ্রজিৎ কখনোই এদের হদিশ পেত না ?"

"শোন, আত্মা আছে কি নেই জানি না, কিন্তু পাপ কখনোই চাপা থাকে না। তুষারবাবু তাঁর স্ত্রী কনকদেবী এবং সুরজিত সামন্ত দুজনের মৃত্যুর জন্য দায়ী হলেও কোনো সাজা পাননি। তাই বোধহয় শেষ বয়সে পাপ-পূণ্যের ভয়টা একটু বেশীই চেপে বসেছিল।"

অরুণিমার এখনও অনেক কিছু জিজ্ঞাস্য আছে, "হৈমন্তীদেবীর বিষয়ে কিছুই জানো না, বাবা?"

অরণাংশু হাসলেন, "শোন, উনিই ইন্দ্রজিতকে তুষারবাবুর হদিশ দেন। উনিও ওই গ্রুপে যোগ দেন, তবে নিজের পরিচয় দেন না। হৈমন্তী সরকার এখন হেমলতা বসু, নিঃসন্তান বিধবা, অনেক বড়লোক পরিবারে বিয়ের পর বউদের নাম চেঞ্জ হয়। তাঁরই ব্যবসা সামলায় মেঘনাদ, তবুও ও বলল যে হৈমন্তীদেবীর বিষয়ে জানে না, কারণ, ও ওর মালকিনের সম্মানহানি চায়নি, আমিও তাই বিষয়টি

গোপন রেখেছি। এতে তো হৈমন্তীদেবীর দোষ ছিলনা। উনি তুষারের বিষয়ে জেনে সরে এসেছিলেন, সুরজিতের পরিবারের পাশেও দাঁড়ান। আইনি পথে হাঁটেননি পরিবারের সম্মানের কথা ভেবে। আর হ্যাঁ, ওইদিন কোনো প্রেতাত্মা আসেনি, সেটা নিশ্চয় আর বলতে হবে না?"

"শেষ প্রশ্ন?"

"কি?"

"রেবতী দেবীর কি সুস্নাতবাবুর সাথে কিছু সম্পর্ক আছে?"

"সব বিষয়ে পাকামি করিস না। অন্যের ব্যক্তিগত বিষয়ে আমাদের কি? তবে ফিঙ্গারপ্রিন্ট মোছার কাজটা উনি করলে নিশ্চয় শাস্তি পাবেন। তবে ওই সময়ে উনি ছিলেন না সেটা প্রমাণিত হলে আলাদা কথা।" অরুণাংশু এবার সিরিয়স মুখে বললেন, "নে, এবার শুয়ে পড়, কাল এক্সাম আছে না?" ■

প্রকাশিত সংখ্যা - ২০১৯

http://online.fliphtml5.com/osgiu/genc/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/zczy/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/btzm/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/fyxj/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/tebb/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/ddla/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/btss/
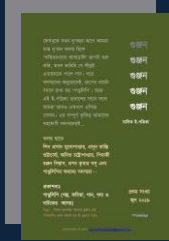
পাঠকদের সুবিধার্থে নিঃশুল্ক বাংলা অনলাইন সাহিত্য পত্রিকা **'গুঞ্জন'এর ২০১৯ এ প্রকাশিত সব সংখ্যাগুলির ই-লিঙ্ক পুনরায় দেওয়া হল।**

প্রকাশিত সংখ্যা - ২০২০

http://online.fliphtml5.com/osgiu/kjbd/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/hljw/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/lmjq/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/dadg/

https://online.fliphtml5.com/osgiu/lgaq/

https://online.fliphtml5.com/osgiu/tefw/

https://online.fliphtml5.com/osgiu/eitj/

https://online.fliphtml5.com/osgiu/vsgw/

https://online.fliphtml5.com/osgiu/lpsr/

https://online.fliphtml5.com/osgiu/xnih/

https://online.fliphtml5.com/osgiu/buzn/

https://online.fliphtml5.com/osgiu/mjwo/

পাঠকদের সুবিধার্থে নিঃশুল্ক বাংলা অনলাইন সাহিত্য পত্রিকা **'গুঞ্জন'এর ২০২০ তে প্রকাশিত সব সংখ্যাগুলির ই-লিঙ্ক এখানে দেওয়া হল।**

জঙ্গুলে খাদক

রিয়া মিত্র

উফ্, আর হাঁটতে পারছে না বৈভবী। দিনের বেলাতেও বড় বড় গাছের পাতাগুলো মাথার ওপর ছাতার মতো ঘিরে আবছা অন্ধকার করে রয়েছে। বারকয়েক দীপক, কুনাল, পিউয়ের নাম ধরে ডাকল সে। নাহ্, কোনো সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। ফেরার পথ তাকে এবার ধরতেই হবে, কিন্তু পথ যে কিছুতেই খুঁজে পাচ্ছে না সে, যেন আরও গভীর জঙ্গলে ঢুকে যাচ্ছে। পায়ের ওপর মনে হচ্ছে যেন, কী একটা সুড়সুড় করছে। অন্যমনস্ক হয়ে হাত দিতেই ভেজা ভেজা লাগল। এ কী! রক্ত! পায়ের ওপর মোটাসোটা লম্বা প্রাণীটার দিকে তাকাতেই আঁৎকে উঠল বৈভবী.... 'জোঁক!' অবশ হয়ে আসছে শরীরটা, মাথা ঘুরছে, জ্ঞান হারানোর আগে মনে হল যেন ক্রমশ বড় হচ্ছে প্রাণীটা, ঠিক সাপের মতো দেখতে হচ্ছে, লম্বা জিভটা পেঁচিয়ে জড়িয়ে ফেলছে বৈভবীকে...

"কী রে, কোথাও পেলি!" চিন্তিত মুখে পিউ বলল। কুনাল দুদিকে মাথা নেড়ে বলল, "নাহ্, আমরা কেউ খেয়াল করলাম না যে, বৈভবী কখন পিছিয়ে পড়েছে।" দীপক আকাশের দিকে তাকিয়ে বলল, "সূর্য ডুবতে চলেছে।

সন্ধ্যার পর এই জঙ্গলে থাকা খুব বিপজ্জনক। এবারে না বেরোলেই নয়।” কুনাল চারিদিকে তাকিয়ে দেখল, জঙ্গলের মধ্যে অন্ধকার নামছে ধীরে ধীরে। শান্ত, নিঃশব্দ জঙ্গলে একটানা ঝিঁঝিঁ ডেকে চলেছে। বৈভবীর নাম ধরে বার কয়েক চিৎকার করল সকলে। জঙ্গলের মধ্যে প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে এল সেই ডাক।

গভীর জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এক পাশে দুটো তাঁবু খাটাল কুনাল। মনের মধ্যে বিভিন্ন চিন্তা দানা বাঁধছে। আজ রাতটা পেরোলেই কাল ভোরে উঠেই বৈভবীকে খুঁজতে বেরোতে হবে। তাঁবুর দড়িগুলো ভালো করে বেঁধে, সে পিউকে বলল, “শুয়ে পড়। কাল ভোরেই বেরোতে হবে।”

পাশের টেন্টটাতেই কুনাল আর দীপক শুয়েছে। ওদের টেন্টের চেনটা ভিতর থেকে আটকানো। পিউ ইচ্ছে করেই ওর টেন্টের চেনটা একটুখানি খুলে রেখেছে, পুরো বন্ধ করলে কেমন যেন দমবন্ধ লাগে। স্থানীয় লোক জহর ওদের জন্য রাতের খাবার এনেছিল – বনমোরগের ঝোল, কিন্তু মনমেজাজ ভালো না থাকায় কেউই ঠিকমতো খেতে পারেনি। শুয়ে শুয়ে সামনের নিকষ কালো জঙ্গলটার দিকে তাকিয়ে বৈভবীর কথাই ভাবছিল পিউ। রাত যত বাড়ছে, ঠাণ্ডাও যেন বাড়ছে। তাঁবুর বাইরে আগুন জ্বলছে ঠিকই, কিন্তু ঠাণ্ডাটা যেন কামড়ে ধরছে। গায়ের ব্ল্যাঙ্কেটটা ভালো করে জড়িয়ে চোখ বুজল পিউ।

হিংস্র

খুব আবছাভাবে দূর থেকে সরসর্ আওয়াজ ভেসে আসছে। তন্দ্রার ঘোরে পিউয়ের একবার মনে হল, ঝিঁঝিঁর আওয়াজ। কিন্তু নাহ্, ঝিঁঝিঁর শব্দ তো আলাদা করে হয়েই চলেছে, এটা অন্য কোনো আওয়াজ। চোখ মেলে তাকাতেই সামনের অস্পষ্ট কুয়াশা-ঘেরা অন্ধকার জঙ্গলটা দেখতে পেল সে। নিঃঝুম রাতে কুয়াশায় ঢাকা জঙ্গলটাকে বেশ মায়াবী লাগছে। এবার স্পষ্ট শুনতে পারল, খুব কাছ থেকে তার নাম ধরে যেন কেউ ডাকছে! এ কী?! এটা তো বৈভবীর গলার আওয়াজ! তাহলে কি বৈভবী পথ চিনে ফিরে আসতে পারল তাঁবুর কাছে! জিজ্ঞাসু-চোখে আধোঘুমে উঠে বসল পিউ। ঘাড়ের কাছটায় চিনচিন করে একটা ব্যাথা করছে, হাত দিতেই চমকে উঠল সে 'জোঁক...' কানের কাছে ভেসে আসল বৈভবীর গলার করুণ আওয়াজ। অবাক হয়ে দেখল, ঘাড়ের কাছের প্রাণীটা ক্রমশ বড় হয়ে লম্বা জিভটা দিয়ে পেঁচিয়ে ফেলছে তাকে...

সমবেত পাখিদের কল-কাকলিতে ঘুমটা ভেঙে গেল দীপকের। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে সে দেখল, ভোর সাড়ে তিনটে বাজে। কুনাল এখনও ঘুমাচ্ছে। ঘুম চোখেই আড়মোড়া ভেঙে তাঁবুর বাইরে বেরিয়ে এল সে। "পিউ কি এত তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল! ওর তাঁবুটা খোলা!" অবাক হয়ে ওর তাঁবুর দিকে এগোতেই দীপক খেয়াল করল, অন্ধকারে ওর দিকে পিছন ঘুরে মাটিতে উবু হয়ে বসে জহর কিছু

একটা করছে। দীপক অবাক হয়ে বলল, “আপনি এত ভোরে এখানে!” জহর উঠে দাঁড়িয়ে ওর দিকে তাকিয়ে রহস্যময় হেসে বলল, “আজ্ঞে, এই এদের নিতে এলাম।” বলে একটা ব্যাগ এগিয়ে দিল ওর সামনে। দীপক বিস্মিত হয়ে দেখল, ব্যাগভর্তি জোঁক! একটু থতমত খেয়ে ও বলল, “ম... মানে!”

“এদের খুব খিদে তো, বাবু। তাই, খাবারের সন্ধান করার জন্য এদের মাঝে মাঝে ছেড়ে রাখতে হয়। শিকার করার পর আবার ভরে ফেলি। যে কোনো খাবারে আবার পেট ভরে না, এরা সব মানুষখেকো জোঁক কিনা...”

দীপকের শিরদাঁড়া বেয়ে একটা ঠাণ্ডা হিমস্রোত নেমে গেল। মানুষখেকো জোঁকের সম্বন্ধে শুনে কৌতূহল নিরসনের জন্যই তাদের এই জঙ্গলে ঘুরতে আসা। আদৌ কি সত্যিই হয় নাকি মানুষখেকো জোঁক?! লোকমুখে শোনা যায়, এই জঙ্গলে নাকি রয়েছে সেই অদ্ভুত জোঁক, যারা বিশালাকৃতি ধারণ করে যেকোনো মানুষের শুধু রক্ত নয়, গোটা প্রাণীটিকেই গিলে নিতে পারে। “তবে কি তা সত্যি! বৈভবী কি তবে!”

জহর ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, “বিশ্বাস হচ্ছে না তো, বাবু! শুধু মানুষকে খায় তাই নয়, দীর্ঘদিন পর্যন্ত সেই মানুষ এদের শরীরে অবস্থানও করে বৈকি। এখানেই বৈভবী ম্যাডাম, পিউ ম্যাডাম সকলেই আছেন।” দীপক

আতঙ্কে পিউয়ের খালি তাঁবুটার দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে বলল, “কী বলছ তুমি!” জহর খ্যাকখ্যাক্ করে হেসে বলল, “যুগের পর যুগ ধরে এদের রক্ষা করার দায়িত্ব আমাদের জঙ্গুলে মানুষদের ওপরই। ঐ দেখুন... এরা কী অস্থির হয়ে পড়েছে। আপনাকে দেখে আবার বুঝি খিদে পেল, বের করতে হবে।” কথাগুলো বলে জহর বের করে আনল সেই জোঁকগুলোকে। দীপক কিছু বলার আগেই দেখল, তার সারা শরীর ঘিরে ফেলছে অসংখ্য জোঁক, ঘুমন্ত কুনালও ঢাকা পড়ে যাচ্ছে জোঁকের আস্তরণে। খুব কাছ থেকেই যেন ভেসে আসছে পিউ আর বৈভবীর করুণ ডাক... জোঁকগুলো বিশালকায় ধারণ করে ক্রমশ পেঁচিয়ে ধরছে দীপক আর কুনালকে... ■

সবিনয় নিবেদন

‘গুঞ্জন’ কেমন লাগল তা অবশ্যই আমাদের জানাবেন। আর আপনার লেখা গুঞ্জনে দেখতে হলে, আপনার সবচেয়ে সেরা (আপনার বিচার অনুযায়ী) এবং অপ্রকাশিত লেখাটি আমাদের ‘ই-মেল’ (contactpandulipi@gmail.com) এ পাঠিয়ে দিন (MS Words + PDF দু’ট ফরম্যাটই চাই)। সঙ্গে আপনার একটি পাসপোর্ট সাইজের ছবিও অবশ্যই থাকা চাই – সাইজঃ ৩৫ mm (চওড়া) X ৪৫ mm (উচ্চতা); রিসল্যুশনঃ 300 DPI হওয়া চাই। আর Facebook এর ‘পাণ্ডুলিপি’ ‘গ্রুপে’-তো অবশ্যই আপনার নিয়মিত উপস্থিতি একান্ত প্রার্থনীয়। তবে লেখা অনুমোদনের ব্যাপারে বিচারক মণ্ডলীর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।

বি.দ্র.: অগাস্ট ২০২১ সংখ্যার লেখা পাঠানোর শেষ তারিখঃ ১৫ই জুলাই, ২০২১

অতৃপ্ত

প্রণব কুমার বসু

খুব ভোরে উঠে গিয়েও দেখি হাওড়া স্টেশনের টিকিট কাউন্টারে বিরাট লাইন। রিটার্ন টিকিট কেটে প্ল্যাটফর্মে ঢুকতে ঢুকতেই শুনতে পেলাম মহিলা কন্ঠে ঘোষণা ‘আপ পাঁশকুড়া লোকাল তেরো নম্বর প্ল্যাটফর্মে আসছে’। ব্যাগ হাতে বেশ দৌড়ে আগের দিকে এগিয়ে গেলাম। ইঞ্জিনের পর বিকলাঙ্গদের কামরা, ভেন্ডারের কামরা আর মহিলাদের জন্য সুরক্ষিত কামরার পরের কামরার মাঝামাঝি গেটের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম।

যাত্রীরা একে একে নেমে গেলো ধীরেসুস্থে জানলার ধারে পছন্দসই একটা সিটে বসলাম। জানলা দিয়ে হাত বাড়িয়ে একটা খবরের কাগজ কিনে নিয়ে বাগনান স্টেশনে নামলাম প্রায় সাড়ে ন'টা নাগাদ। চায়ের দোকানে এক কাপ গরম চা আর বিস্কুট খেয়ে কাজ শুরু। শীতের দিনে কাজের ফাঁকে কয়েক কাপ গরম চা না হলে ঠিক জমে না। গতানুগতিক কাজ — ডাক্তার ভিজিট, রিটেল কাউন্টারে অর্ডার নেওয়া শেষ করতে প্রায় দু'টো বেজে গেল। এরপর স্টকিস্টের ঘরে ঢোকা নানা রকম স্কীম ইত্যাদি আলোচনা করে অর্ডার ও পেমেন্ট কালেকশন সাড়ে তিনটের সময় পাঁশকুড়া স্টেশনে পৌঁছে মনে হলো পেটে কিছু না দিলে আর ফুলেশ্বর পৌঁছতে পারব না। চারটে ফ্রেঞ্চ টোস্ট আর গরম চা খেয়ে সাময়িক সামাল

দেওয়া গেল। ডাউন ট্রেন এল চারটে পঁয়ত্রিশ মিনিটে ফুলেশ্বর স্টেশনে যখন নামলাম তখন প্রায় সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। অবশ্য কাজ অল্পই, এক ডাক্তারবাবুকে তাঁর নিজস্ব প্রয়োজনে কয়েকটা স্যাম্পেল পৌঁছে দেওয়া। তারপর আজকের মতো কাজ শেষ, ট্রেন ধরে সোজা হাওড়া। কী মনে হল — হেঁটেই যাই। মিনিট দশেকের রাস্তা। কিছুটা হেঁটে যাবার পর মনে হল কে যেন ঠিক পেছনেই হাঁটছে! আধো অন্ধকারে তাকিয়ে দেখলাম একটা মেয়ে। আমি তাকাতেই বলল, "আমায় একটু এগিয়ে দেবেন। আমি সামনের দিকেই যাব ঘাড় নেড়ে সম্মতি দিতেই পাশে হাঁটতে শুরু করেছে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলাম বিফোর টাইম পৌঁছে গেছি। মিনিট পনেরো অপেক্ষা করতে হবে। সামনে তাকিয়ে দেখলাম একটা ঝুপড়ির দোকান, ভাবলাম ওখানেই অপেক্ষা করব। জানিনা মেয়েটা কীভাবে আমার মনের কথাটা বুঝে গিয়ে বলল, "আমি ঐ পাশের বাড়ি থেকে দু'মিনিটেই আসছি আপনি ঐ দোকানে বসুন।" চা খাওয়া শেষ হয়ে গেল। কিন্তু মেয়েটা এখনো আসছে না। উশখুশ করছি দেখে দোকানদার ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন, "কারও জন্য অপেক্ষা করছেন? আমি এবার দোকান বন্ধ করব।"

আমি মেয়েটার কথা বলতেই উনি বললেন, "সুমি আপনাকেও ধরে ছিল!"

আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "মানে?"

"ঘোষপাড়ার সুমিত্রা, যাকে সকলেই সুমি বলে ডাকত, ঐ লাইনেই গলা দিয়েছিল মাস চারেক আগে।" ■